দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা

নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে ৬২২ ঈসায়ী সালের জুন মাসে ইয়াছরেব তথা মদীনা থেকে ৭০ জন মুসলমান হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় আগমন করেন। এরা নিজ কওমের পৌত্তলিক হাজীদের সঙ্গে মক্কায় এসেছিলেন। মদীনায় থাকার সময়েই অথবা মক্কায় আসার পথে তারা পরস্পরকে বললেন, কতোদিন পর্যন্ত প্রিয় রসূলকে আমরা মক্কায় এভাবে কষ্টকর অবস্থায় ফেলে রাখব? তিনি মক্কায় যেভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন সে সম্পর্কেও তারা আলোচনা করলেন।

মক্কায় পৌছার পর গোপনে তারা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যোগাযোগ করলেন এবং সিদ্ধান্ত হলো যে, উভয় দল আইয়ামে তাশরিকের মাঝামাঝি ১২ই জিলহজ্জ তারিখে মিনার জামারা উলায় অর্থাৎ জামরায়ে আকবার ঘাঁটিতে একত্রি হবেন এবং রাতের অন্ধকারে গোপনীয়ভাবে তারা আলোচনা করবেন।

হযরত কাব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা হজ্জ এর জন্য বেরিয়েছিলাম। প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আইয়ামে তাশরিকের মাঝে আকাবায় আমাদের সাথে কথা বলার সময় নির্ধারণ করলেন। অবশেষে সেই রাত এলো যে রাতে কথা বলার তারিখ ছিল। আমাদের সাথে আমাদের সম্মানিত নেতা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারামও ছিলেন। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। আবদুল্লাহ ইবনে হারামের সাথে আমরা আলোচনা করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবু জাবের আপনি আমাদের একজন সম্মানিত নেতা। আপনার বর্তমান অবস্থা থেকে আমারা আপনাকে বের করতে চাই। অনন্তকাল দোযখের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করবেন এটাই আমরা চাই। এরপর আমরা তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম এবং প্রিয় নবী(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)র সাথে আমাদের আলোচনার বিষয় তাঁকে জানালাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের সাথে আকাবায় গেলেন।

হযরত কাব (রাঃ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, সেই রাতে আমরা নিয়ম অনুযায়ী আমাদের ডেরায় শুয়ে পড়লাম। রাতের এক তৃতীয়াংশ কেটে যাওয়ার পর আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় মিলিত হলাম। আমরা আকাবায় সমবেত হলাম। সংখ্যায় ছিলাম আমরা ৭৫ জন। ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। দু'জন হচ্ছেন উম্মে আম্মারা নাছিবা বিনতে কাব এবং উম্মে মানীঈ আসমা বিনতে আমর।

আমরা সবাই ঘাঁটিতে পৌছে রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এক সময় তিনি এসে পৌঁছলেন। তাঁর সাথে তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব ছিলেন। তিনি তখনো যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি তবু ভ্রাতুষ্পুত্রের হিতাকাঙ্খী ছিলেন। সর্বপ্রথম কথা বার্তা তিনিই শুরু করেন।

পরিস্থিতির নাজুকতা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যাঃ

সম্মেলন শুরু হলো। দ্বীনী এবং সামরিক সহায়তাকে চূড়ান্ত রুপ দেয়ার জন্য সম্মেলনে আলোচনা শুরু হলো। রসূলের চাচা আব্বাস প্রথমে কথা বললেন। তিনি বলেন, (হে খাযরাজ

সম্প্রদায় আমাদের মাঝে মোহাম্মদ মোস্তফার যে মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে সেটা তোমরা জানো। আমাদের কওমের মধ্যে মোহাম্মদ প্রবর্তিত ধর্ম বিশ্বাস যারা সমর্থন করে না মোহাম্মদকে তাদের নিকট থেকে আমরা দূরে রেখেছি। নিজ শহরে স্বজাতীয়দের মধ্যে তিনি নিরাপদে রয়েছেন। তিনি বর্তমানে তোমাদের কাছে যেতে চান। তোমাদের মধ্যে মিশতে চান, যদি তোমরা তাঁর নিরাপত্তা দিতে পারো বিরোধী পক্ষের হামলা থেকে তাঁকে হেফাযত করতে পারো তবে কিছু বলার নেই। তোমরা যে দায়িত্ব নিয়েছ সে সম্পর্কে তোমরাই ভালো জানো। কিন্তু যদি তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা করে থাকো তবে এখনই চলে যাও। কেননা তিনি স্বজাতীয়দের মধ্যে নিজ শহরে নিরাপদেই রয়েছেন। তাঁর সম্মানও এখনে রয়েছে।)

হযরত কাব বলেন, আমরা হযরত আব্বাসকে বললাম যে, আপনার কথা আমরা শুনেছি। হে আল্লাহর রসূল! এবার আপনি কথা বলুন। আপনি নিজের জন্য এবং আপনার প্রতিপালকের জন্য আমাদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিতে চান তাই নিন। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কথা শুরু করলেন। তিনি প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত করলেন। আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন। এরপর বাইয়াত হলো।

বাইয়াতের দফাসমূহঃ

১) ভালোমন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং মানবে।
২) স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই ধন-সম্পদ ব্যয় করবে।
৩) সৎ কাজের আদেশ দেবে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।
৪) আল্লাহর পথে উঠে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কারো ভয়ভীতি প্রদর্শনে পিছিয়ে যাবে না।
৫) তোমাদের কাছে যাওয়ার পর আমাকে সাহায্য করবে এবং নিজেদের প্রাণ ও সন্তানদের হেফাযতের মতোই আমার হেফাযত করবে তোমাদের জন্য । বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

বাইয়াত শুরু:

তারা বাইয়াতের দফা সমূহ নির্ধারণ করার পর এবং পরিস্থিতির গুরুতর অবস্থা তুলে ধরার পর মুসাফাহর মাধ্যমে বাইয়াত শুরু হল। একজন করে উঠলেন, আর প্রিয় রসূল তাদের নিকট বাইয়াত নিলেন। বিনিময়ে তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। সেই সম্মলনে উপস্থিত দুজন মহিলা মৌখিকভাবে বাইয়াত করেছিলেন। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কখনোই অপরিচিতা মহিলার সাথে করমর্দন করেননি।

বাইয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রস্তব করলেন যে, বারোজন নেতা মনোনীত করা হোক। এরা হবে তাদের কওমের নকীব। এরা বাইয়াতের শর্তাবলী নিজ কওমের লোকেদের দ্বারা পূরণ করার দায়িত্ব পালন করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ১২ জন নকীব মনোনীত করা হলো। ৯ জন খাযরাজ গোত্রের ৩ জন আওস গোত্রের ছিলেন। তারা নকীব

নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের নিকট থেকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পুনরায় দায়িত্বশীল ও নেতা হিসেবে আলাদাভাবে একটি অঙ্গীকার নিলেন।

শয়তান কর্তৃক চুক্তির তথ্য ফাঁসঃ

চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সবাই চলে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন এমন সময় শয়তান সম্মেলনের বিষয়ে জেনে গেল। কোরায়েশদের কাছে খবর পৌঁছানোর সময় ছিল না। যদি পৌঁছাতো তবে তারা সংঘবদ্ধভাবে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। এ কারণে শয়তান উঁচু পাহাড় চূড়ায় উঠে উচ্চস্বরে বললো, মিনাবাসীরা মোহাম্মদকে দেখো। বে-দ্বীন লোকেরা বর্তমানে তার সঙ্গে রয়েছে। তোমাদের সাথে লড়াই করার জন্য তারা সমবেত হয়েছে।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন, (ওটা হচ্ছে এই ঘাঁটির শয়তান। ওরে আল্লাহর দুশমন, শুনে রাখ, খুব শীঘ্রই আমি তোর জন্য সময় পাচ্ছি।) এরপর তিনি লোকদের বললেন, তারা যেন নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যায়।

কোরায়েশরা এ খবর পাওয়ার পর দিশেহারা হয়ে পড়লো। কেননা এ ধরনের বাইয়াতের সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল। পরদিন সকালে কোরায়েশদের একদল বিশিষ্ট লোক মদীনাবাসী আগন্তুকদের তাঁবুর সামনে গিয়ে গত রাতের সম্মেলনের এবং বাইয়াতের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলো। মদীনা থেকে আসা খাযরাজ গোত্রের অমুসলিম তীর্থযাত্রীরা বলল, তোমাদের কথা ঠিক নয়। তারা কসম করে বলল, এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে না। আমরা কিছুই জানিনা। মুসলমানরা এতে অন্যের প্রতি আড়চোখে তাকালেন। তারা ছিলেন চুপচাপ। তাঁরা হাঁ বা না কিছুই বললেন না। এক সময় কোরায়েশ নেতারা বুঝলো যে, আশঙ্কা করার মতো কিছু আসলে ঘটেনি। অবশেষে তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা। এটাকে বাইয়াতে আকাবা কোবরাও বলা হয়। এই বাইয়াত এমন পরিবেশে হয়েছিল যে, ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা, বিশ্বাস, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রেরণা এখানে জাগরুক ছিল। মদীনার ঈমানদারদের অন্তর মক্কার দুর্বল ভাইদের প্রতি ভালোবাসায় ছিল পরিপূর্ণ। সাহায্য করার উদ্দীপনায় মনে ছিল দুর্বার সঙ্কল্প। অত্যাচারী বিধর্মীদের জন্য অন্তরে ছিল ক্রোধ ও ঘৃণা। আর এর উৎস ছিল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের প্রতি দৃঢ় ঈমান। এমন শক্তিশালী ঈমান যা যে কোন শত্রুতা ও অত্যাচারী শক্তির সামনে অটল ও অবিচল থাকবে।

প্রশ্নমালাঃ

১) কখন দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা হয়েছে? বাইয়াতকারীদের সংখ্যা কত ছিল?
২) কেন বাইয়াতের সময় আব্বাস উপস্থিত হয়েছিলেন? তিনি কি সে সময় মুসলমান ছিলেন?
৩) সংক্ষেপে বাইয়াত সংঘটিত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা কর।
৪) বাইয়াতের তথ্য কে ফাঁস করেছিল? এবং সে কি করেছিল?

নতুন দেশে হিজরত

হিজরতের পূর্বাভাষঃ

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম কুফুরী ও মূর্খতার অন্ধকারের মধ্যে নিজের জন্য একটি আবাসভূমির বুনিয়াদ রাখতে সক্ষম হলো। দাওয়াতের শুরু থেকে এটা ছিল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের অনুমতি দিলেন তারা যেন নিজেদের নতুন দেশে হিজরত করে চলে যায়। হিজরত অর্থ হচ্ছে সব কিছু পরিত্যাগ করে শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য কোথাও চলে যাওয়া। তবে এই প্রাণও শঙ্কামুক্ত নয়। যাত্রা শুরু থেকে গন্তব্যে পৌছা পর্যন্ত যে কোন জায়গায় এই প্রাণ সংহার হয়ে যেতে পারে। যাত্রা শুরু হচ্ছে এক অস্পষ্ট অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে। ভবিষ্যতে কি ধরনের বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন হতে হবে সে সম্পর্কে আগে ভাগে কিছু বলা যায় না।

এসব কিছু জেনে বুঝেই মুসলমানরা হিজরত শুরু করেন। এদিকে পৌত্তলিকরা মুসলমানদের যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো। নীচে হিজরতের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

এক) প্রথম মোহাজের ছিলেন হযরত আবু সালমা (রাঃ)। স্ত্রী এবং সন্তানরাও তার সাথে ছিলেন। তিনি রওয়ানা হতে শুরু করলে তাঁর শ্বশুরালয়ের লোকেরা বললো, আপনার নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের চেয়ে আপনার বেশী রয়েছে। কিন্তু আমাদের মেয়ের কি হবে? আপনি তাকে শহরে শহরে ঘোরাবেন এটা জানার পরও কিভাবে তাকে আপনার সাথে যেতে দিতে পারি? সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আবু সালমার স্ত্রীকে তার মা-বাবা রেখে দিলেন। এ খবর পাওয়ার পর আবু সালমার মা-বাবা ক্ষেপে গেলেন। তারা নিজেদের পৌত্রকে কেড়ে নিয়ে এলেন। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এক ধাত্রীর কাছে প্রতিপালনের জন্য দেয়া হলো। এর আগে এক জায়গায় শিশুকে উভয় পক্ষ টানাটানি করায় শিশুর হাতে ব্যাথা পেল। মোট কথা হযরত আবু সালমা (রাঃ) একা মদীনায় চলে গেলেন। এদিকে স্বামী সন্তান ছেড়ে উম্মে সালমা পাগলিনীর মত হয়ে গেলেন। যেখানে তাঁর স্বামী বিদায় নিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তানকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল সেই জায়গার নাম ছিল আবত্বাহ। প্রতিদিন সকালে তিনি আবত্বাহ যেতেন এবং সারাদিন বিলাপ করতেন। এভাবে এক বছর কেটে গেল। অবশেষে উম্মে সালমার একজন আত্মীয় উম্মে সালমার মা-বাবাকে বলল, বেচারীকে কেন আপনারা স্বামীর কাছে যেতে দিচ্ছেন না? এরপর তার মা-বাবা তাকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে যেতে পার। উম্মে সালমা তখন শ্বশুরালয়ে গিয়ে সন্তানকে ধাত্রীর নিকট থেকে নিয়ে নিলেন এবং একাকী সন্তানসহ মদীনা রওয়ানা হলেন। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার। তানঈম নামক জায়গায় পৌছার পর ওসমান ইবনে আবু তালহার সাথে দেখা হলো। উম্মে সালমা তাকে সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে ওসমান তাকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হলেন। এরপর ওসমান মক্কায় ফিরে এলেন।

দুই) হযরত সোহায়েব মদীনায় হিজরত করার ইচ্ছা করলে কোরায়েশ পৌত্তলিকরা বলল, তুমি আমাদের কাছে যখন এসেছিলে তখন তুমি ছিলে নিঃসঙ্গ কাঙ্গাল। এখানে আসার পর তোমার অনেক ধন-সম্পত্তি হয়েছে। তুমি অনেক উন্নতি করেছ। এখন তুমি সেসব নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে চাও? সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। হযরত সোহায়েব বললেন, আমি যদি ধন-সম্পদ সব ছেড়ে যাই তবে কি তোমরা আমাকে যেতে দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ দেব। হযরত সোহায়েব বললেন, ঠিক আছে তাই হোক। সব কিছু তোমাদের কাছে রেখে গেলাম। প্রিয় নবী এ খবর পাওয়ার পর মন্তব্য করলেন, সোহায়েব লাভবান হয়েছে সোহায়েব লাভবান হয়েছে।

হিজরত করার জন্য কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে এ খবর পাওয়ার পর পৌত্তলিকরা তাদের সাথে যেরুপ ব্যবহার করতো, এখানে তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলো। কিন্তু এতো বাধা সত্ত্বেও ঈমানের সম্বল বুকে নিয়ে মুসলমানরা হিজরত করতে থাকেন। দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার দুই মাস কয়েক দিন পর মক্কায় নবী ﷺ হযরত আবু বকর এবং হযরত আলী (রা:) ছাড়া অন্য কোন মুসলমান ছিলেন না। এরা দুজন প্রিয় নবীর নির্দেশ অনুযায়ী মক্কায় রয়ে গেলেন। কয়েকজন মুসলমান এমন ছিলেন যে, তাদেরকে পৌত্তলিকরা জোর করে আটকে রেখেছিল। রসূল ﷺ মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহ পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সফরের সাজ সরঞ্জাম বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন।

দারুন্নদওয়া (কুরাইশদের পার্লামেন্ট):

মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদ দৃঢ় হওয়ার এবং মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে মদীনাবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিণাম কতো মারাত্মক- পৌত্তলিকরা এ সব আশঙ্কা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত ছিল এবং তারা বুঝতে পারছিল যে, সামনে কঠিন সময় ও কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ কারণে তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কার্যকর প্রতিষেধক সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলো। তারা জানতো যে, এসব বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির মূলে রয়েছেন ইসলামের পতাকাবাহী মোহাম্মদ ﷺ স্বয়ং নিজে।

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার প্রায় আড়াই মাস পর ২৬ সফর, ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের শুক্রবার সকালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মক্কার পার্লামেন্টে দারুননোদওয়ায় ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে মক্কার কোরায়েশদের সকল গোত্রের প্রতিনিধি যোগাদান করে। আলোচ্য বিষয় ছিল এমন একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করা যাতে ইসলামী দাওয়াতের নিশানবরদারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া যায় এবং ইসলামের আলো চির দিনের জন্য নিভিয়ে দেয়া যায়।

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে প্রতিনিধিরা দারুননোদওয়ায় পৌছে গেল। এ সময় ইবলিস শয়তান একজন বৃদ্ধের রুপ ধারণ করে সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে ছিল জোব্বা। প্রবেশদ্বারে তাকে দেখে লোকেরা বলল, আপনি কে, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। শয়তান বলল, আমি নজদের অধিবাসী, একজন শেখ। আপনাদের প্রোগ্রাম শুনে হাযির হয়েছি। কথা

শুনতে চাই, কিছু কার্যকর পরামর্শ দিতে পারব আশা করি। পৌত্তলিক নেতারা শয়তানকে যত্ন করে স্বসম্মানে নিজেদের মধ্যে বসালো।

আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার নীলনকশাঃ

সবাই হাযির হওয়ার পর আলোচনা শুরু হলো। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর নানা প্রকার প্রস্তাব পেশ করা হলো। প্রথমে আবুল আসওয়াদ প্রস্তাব করলো যে, তাঁকে আমরা আমাদের মধ্য থেকে বের করে দেব। তাকে মক্কায় থাকতে দেব না। শেখ নজদী রুপী শয়তান বলল আল্লাহর কসম এটা কোন কাজের কথা নয়। তোমরা কি লক্ষ্য করোনি যে, তার কথা কতো উত্তম কতো মিষ্টি। তিনি সহজেই মানুষের মন জয় করেন। আবুল বুখতারী বলল, তাকে লোহার শেকলে বেঁধে আটক করে রাখা হোক। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে একটা বন্ধ ঘরে রাখা হোক। এতে করে সেই ঘরে তার মৃত্যু হবে।

শেখ নজদী রুপী বলল, আল্লাহর কসম, এ প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লিখিত দুটি প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর তৃতীয় একটি প্রস্তাব পেশ করা হলো। মক্কার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধী আবু জেহেল এ প্রস্বাব উত্থাপন করলো। সে বলল, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যুবককে বাছাই করে তার হাতে একটি ধারালো তলোয়ার দেয়া হবে। এরপর সশস্ত্র শক্তিশালী যুবকরা একযোগে তাকে হত্যা করবে। এমনভাবে মিলিত হামলা করতে হবে দেখে যেন মনে হয় একজন আঘাত করেছে। এতে করে আমরা এই লোকটির হাত থেকে রেহাই পাব। এমনিভাবে হত্যা করা হলে তবে হত্যার দায়িত্ব সকল গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনু আবদে মান্নাফ সকল গোত্রের সাথে তো যুদ্ধ করতে পারবে না।

শেখ নজদী রুপী শয়তান এ প্রস্তাব সমর্থন করলো। মক্কার পার্লামেন্ট এ প্রস্তাবের ওপর ঐক্যমত্যে উপনীত হলো। সবাই এ সঙ্কল্পের সাথে ঘরে ফিরলো যে, অবিলম্বে এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে।

আল্লাহর রসূলের হিজরতঃ

রসূলে মকবুল ﷺ কে হত্যা করার জঘন্য প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে প্রিয় নবীর নিকট হাযির হন। তিনি নবীকে কোরায়েশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে বলেন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। হিজরত করার সময় জানিয়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রিয় নবীকে বললেন, আপনি আজ রাত আপনার বাসভবনের বিছানায় শয়ন করবেন না।

এখবর পাওয়ার পর প্রিয় নবী ঠিক দুপুরের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বাড়ীতে গেলেন। তিনি মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। এ সময় সাধারনতঃ তিনি আসতেন না। নবী ﷺ আবু বকরকে বললেন, তোমার কাছে যারা রয়েছে তাদের সরিয়ে দাও। আবু বকর বললেন, শুধু আপনার স্ত্রী রয়েছে। রসূল বললেন, আমাকে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বকর

জিজ্ঞাসা করলেন, সঙ্গে আমি? হে রসূল আপনার ওপর আমার মা-বাবা কোরবান হউন, যে আল্লাহর রসূল। প্রিয় রসূল বললের, হ্যাঁ।

এরপর হিজরতের কর্মসূচী তৈরী করে তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন এবং রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আল্লাহর রসূলের বাসভবন ঘেরাওঃ

এদিকে কোরায়েশদের নেতৃস্থানীয় অপরাধীরা মক্কার পার্লামেন্ট দারুনোদওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সারা দিনব্যাপী প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। জঘন্য অপরাধীদের মধ্যে থেকে এগারোজন সর্দারকে বাছাই করা হলো।

রাতের আঁধার ঘন হয়ে এলে এগারোজন দুর্বৃত্ত নবী ﷺ এর বাসভবনের চারিদিকে ওৎ পেতে রইলো। তারা অপেক্ষা করছিল যে, তিনি শুয়ে পড়লে তারা একযোগে হামলা করবে। দুর্বৃত্তরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অবশ্যই সফল হবে।

ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল রাত বারোটার পর। এ কারণে নির্ঘুম চোখে নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষায় তারা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর ইচ্ছা সফল করে থাকেন। তিনি আসমান যমীনের বাদশাহ। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে বাঁচাতে চান কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। যাকে পাকড়াও করতে চান কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। এই সময়েও আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেছিলেন তাই করলেন। প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, স্মাণ কর, কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার জন্য, নির্বাসিত করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন, আর আল্লাহই কৌশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। (সুরা আনফাল, আয়াত ৩০)

আল্লাহর রসূলের গৃহত্যাগঃ

এমনি নাযুক পরিস্থিতিতে প্রিয় নবী হযরত আলীকে বললেন, তুমি আমর এই সবুজ হাদরামি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। ওদের হাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। প্রিয় নবী এই চাদর গায়ে দিয়ে রাতে ঘুমোতেন।

আল্লাহর রসূল এরপর বাইরে এলেন একমুঠো ধুলো নিয়ে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। এতেই আল্লাহ পাক তাদের অন্ধ করে দিলেন। তারা আল্লাহর রসূলকে তেখতে পেলো না। সে সময় প্রিয় রসূল পাক কোরআনের এই আয়াত তেলওয়াত করছিলেন, আমি ওদের সামনে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করছি এবং ওদেরকে আবৃত করেছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না। (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৯)

প্রতিটি পৌত্তলিকের মাথায় নিক্ষিপ্ত ধুলি গিয়ে পড়লো এরপর তিনি হযরত আবু বকরের বাড়ীতে গেলেন সেই ঘরের একটি জানালা পথে বেরিয়ে উভয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে ইয়েমেনের পথে যাত্রা করলেন। রওয়ানা হওয়ার পর কয়েক মাইল দূরে আস্থিত ছুর পাহাড়ের একটি গুহায় তারা যাত্রা বিরতি করলেন।

এদিকে অবরোধকারীরা নির্ধারিত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই তারা নিজেদের ব্যর্থতার কথা জেনে ফেললো। অপরিচিতি একজন লোক এসে দুর্বৃত্তদের বলল, আপনারা এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছেন? তারা বলল, মোহাম্মদের জন্য। সেই লোক বলল, আপনাদের ইচ্ছা পূরণ হবার নয়। আল্লাহর কসম, মোহাম্মদ আপনাদের মাথায় ধুলি নিক্ষেপ করে আপনাদের সামনে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেছেন। তারা একথা শুনে বলল, কই আমরা তো তাকে দেখলাম না। তারা সবাই নিজের মাথায় হাত দিয়ে ধুলি দেখতে পেলো। তারা এরপর ধুলো ঝেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালো।

এরপর প্রিয় রসূলের ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলো নবীর বিছানায় কেউ শুয়ে আছেন। ওরা হযরত আলীকেই আল্লাহর রসূল মনে করে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। সকালে হযরত আলীকে শয্যাত্যাগ করতে দেখে দুবৃত্তরা চুড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে পড়লো। তারা হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলো আল্লাহর রসূল কোথায়? হযরত আলী বললেন, আমি জানি না। আর এই ভাবে হযরত আলী ইসলামের জন্য জান কোরবান করতে উদ্দোগী প্রথম ব্যক্তি।

ঘর থেকে গারে ছুরেঃ

প্রিয় রসূল ২৭শে সফর মোতাবেক ১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে হিজরত করেন। মদীনার পথ হচ্ছে মক্কা থেকে উত্তর দিকে আর ইয়েমেনের পথ দক্ষিণ দিকে। পাঁচ মাইল অতিক্রমের পর প্রিয় নবী একটি পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছুলেন, সেই পাহাড় ‘ছুর পাহাড় নামে’ পরিচিত। একটি সুউচ্চ পাহাড়। এই পাহাড়ে ওঠা খুব কষ্টকর। এখানে বহু পাথর রয়েছে। সেই পাথর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রিয় রসূলের চরণযুগল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, পায়ের ছাপ গোপন নাখার উদ্দেশ্যে তিনি পায়ের গোড়ালী দিয়ে হাঁটছিলেন। এ কারণে তাঁর পা জখম হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথমে পাহাড়েরর কিছু অংশ উঠে প্রিয় রসূলকে ওপরে উঠতে সহায়তা করেন। এরপর উভয়ে পাহাড় চূড়ার একটি গুহায় আশ্রয় নেন। এই গুহা ইতিহাস গারে ‘ছুর নামে’ বিখ্যাত।

গুহার কাছে পৌঁছে আল্লাহর রসূলকে আবু বকর (রাঃ) বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। গুহায় কোন কিছু থাকলে তার মোকাবেলা আমার সাথেই যা হবার হবে। এরপর তিনি গুহায় প্রবেশ করে গুহা পরিস্কার করলেন। কয়েকটি গর্ত ছিল, যেগুলো তহবন্ধ ছিড়ে বন্ধ করলেন। দুটি গর্ত বাকি ছিল, সেগুলোতে পা চাপা দিয়ে প্রিয় রসূলকে ভেতরে যাওয়ার আহবান জানালেন। প্রিয় নবী ভেতবে গেলেন এবং আবু বকরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে কিসে যেন দংশন করলো। কিন্তু প্রিয় রসূলের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি নড়াচড়া করলেন না। বিষের কষ্টে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো, বেখেয়ালে এক ফোটা অশ্রু প্রিয় রসূলের চেহারায় পড়তেই তিনি জেগে গেলেন। আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন কিসে যেন আমকে দংশন করেছে।

একথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ খানিকটা থুথু নিয়ে দংশিত স্থানে লাগিয়ে গিলেন। সাথে সাথে বিষের যাতনা দূর হয়ে গেল। এখানে উভয় তিন দিন অবস্থান করেন। শুক্র শনি ও রবিবার। এ

সময়ে হযরত আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহও সেই সময় একই সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। হযরত আয়েশা বলেন, আবদুল্লাহ ছিল খুব বুদ্ধিমান যুবক। শেষ রাতে উভয়ের নিকট থেকে চলে আসতো এবং মক্কায় তাকে সকাল বেলা দেখা যেতো। যে কেউ দেখে ভাবতো রাতে সে মক্কাতেই ছিল। সারাদিন উভয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যেসব কথা শুনতো সে সব মনে রাখতো। সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সেসব খবর নিয়ে ‘গারে ছুরে’ চলে যেতো।

এদিকে হযরত আবু বকরের ক্রীতদাস আমের ইবনে ফোহায়রা বকরি চরাতেন। রাতের আঁধার গভীর হলে তিনি বকরি নিয়ে তাদের কাছে যেতেন এবং দুধ দোহন করে দিতেন। উভয়ে তৃপ্তির সাথে দুধ পান করতেন। খুব ভোরে আমরে বকরি নিয়ে রওয়ানা হতেন। তিন রাতেই তিনি এরুপ করেছিলেন। এছাড়া আমের ইবনে ফোহায়রা আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের মক্কা যাওয়ার চিহ্ন সেই পথে বকরী তাড়িয়ে মুছে দিতেন।

কোরায়েশদের অভিযানঃ

কোরায়েশদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর তারা যখন পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলো যে, আল্লাহর রসূল তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছেন তখন তারা যেন উন্মাদ হয়ে গেল। প্রথমে তারা হযরত আলীর ওপর তাদের ক্রোধ প্রকাশ করলো। তাকে টেনে হিচড়ে কাবাঘরে নিয়ে গেল এবং কথা আদায়ের চেষ্টা করলো। কিন্তু এতে কোন লাভ হলো না। এরপর তারা হযরত আবু বকরের বাড়ীতে গেল। দরজা খুললেন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তোমার আব্বা কোথায়? তিনি বললেন, আমি তো জানি না। এ জবাব শুনে দুর্বৃত্ত আবু জেহেল আসমাকে এতো জোরে চড় দিলো যে, তার কানের বালি খুলে পড়ে গেল।

এরপর কোরায়েশ নেতারা এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, আল্লাহর রসূল এবং হযরত আবু বকরকে গ্রেফতার করার জন্য সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। মক্কা থেকে বাইরের দিকে যাওয়ার সকল পথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলো। সেই সাথে ঘোষণা করা হলো যে, যদি কেউ হযরত মোহাম্ম এবং আবু বকরকে বা দুজনের একজনকে জীবিত বা মৃত হাযির করতে পারে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। এ ঘোষণা সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হবার পর চারিদেকে বহু লোক বেরিয়ে পড়লো। পায়ের চিহ্ন বিশারদরাও উভয়কে তালাশ করতে লাগলো। পাহাড়ে প্রান্তরে উঁচু নীচু এলাকায় সর্বত্র চষে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু এতো কিছু করেও কোন লাভ হলো না।

অনুসন্ধানকারীরা ছুর পাহাড়ের গুহার কাছেও পৌছলো। কিন্তু সারা দুনিয়ার বাদশাহ আল্লাহ পাক নিজের ইচ্ছাকেই পূর্ণতা দান করেন। সহীহ বোখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন য, হযরত আবু বকর বলেন, আমি প্রিয় রসূলের সাথে গুহায় ছিলাম, মাথা তুলতেই দেখি লোকদের পা দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, ওরা কেউ যদি একটুখানি নীচু হয়ে এদিকে তাকায় তবেই আমাদের দেখতে পাবে। প্রিয় রসূল বললেন, আবু বকর চুপ করো, আমরা এখানে দুজন নই এবং আমাদের সাথে তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে,

প্রিয় রসূল বলেছেন, আবু বকর এমন দুঃজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ্ তায়ালা।

মদীনার পথেঃ

মক্কার কোরায়েশদের নেতৃত্বে পুরস্কার লোভী লোকদের অনুসন্ধান তৎপরতা নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। ক্রমাগত তিনদিন অনুসন্ধান করে তারা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়লো। তাদের অনুসন্ধান উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এলো। এ অবস্থা লক্ষ্য করে প্রিয় রসূল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। বিভিন্ন পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত লাইছির সাথে আগেই চুক্তি হয়েছিল যে, তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই দুইজনকে মদীনায় পৌঁছে দেবেন। কোরায়েশদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর থাকলেও এ লোকটি ছিল বিশ্বস্ত, এ কারণে সওয়ারী তাকে দেয়া হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল যে, তিনদিন পর যে দুটি সওয়ারীসহ ছুর গুহার সামনে যাবে। সোমবার রাতে ১লা রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালে আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত সওয়ারী নিয়ে এলেন।

এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর উটের ওপর বিছানোর বিছানা নিয়ে এলেন। কিন্তু বাঁধার দড়ি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আসমা উটের পিঠে বিছানা রাখার পর দেখা গেল বাঁধার দড়ি রেখে এসেছেন। তিনি তখন নিজের কোমরবন্দ খুলে সেটি দুভাগ করে ছিড়লেন তারপর বিছানা উটের পিঠের সাথে বেঁধে দিলেন, অন্য অংশ নিজের কোমরে বাধলেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়েছিল ‘যাতুন নেতাকাইন’।

এরপর প্রিয় রসূল ﷺ এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) রওয়ানা হলেন আমের ইবনে ফোহায়রাও সঙ্গে ছিলেন। পথের দিশারী আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত উপকূলীয় পতে মদীনা রওয়ানা হলেন।

গারে ছুর থেকে বেরোবার পর আবদুল্লাহ প্রথমে ইয়েমেনের দিকে গেলেন এবং দক্ষিণ দিকে বহ্ দূর অগ্রসর হলেন। এরপর পশ্চিমভিমুখী হয়ে সমুদ্রোপকূল ধরে যাত্রা করলেন। এরপর এমন এক পথে চলতে লাগলেন যে পথ সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা কেউ অবহিত ছিল না। যে পথ ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এ পথে খুব কম সময়েই লোক চলাচল করতো।

এ সফরের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) রসূলের পেছনে বসতেন। পথচারীদের দৃষ্টি তাঁর দিকেই যেতো প্রথমে, কারণ তাঁর চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ ছিল। তাঁর তুলনায় রসূলকে কমবয়সী মনে হচ্ছিল। পথচারীদের কেউ যখন জিজ্ঞাসা করতো যে, আপনার সামনে উনি কে? হযরত আবু বকর (রাঃ) জবাব দিতেন যে, উনি আমাকে পথ দেখান। প্রশ্নকারী বুঝতো যে মরুভুমিতে পথ দেখাচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নেকী ও কল্যাণের পথের কথাই বোঝাতেন।

এই সফরের সময় প্রিয় নবী উম্মে মাবাদ খোযায়ার তাঁবুতে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। প্রিয় নবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে? মহিলা বললেন, যদি কিছু থাকতো তবে আপনাদের মেহমানদারিতে ক্রটি করতাম না।

আল্লাহর রসূল লক্ষ্য করলেন যে, বাড়ীর এক পাশে একটি বকরি বাঁধা আছে। তিনি বললেন, উম্মে মাবাদ, এ বকরি এখানে কেন? উম্মে মাবাদ বললেন, এ বকরি খুব দুর্বল, হাঁটতে পারে না। প্রিয় রসূল ﷺ বললেন, অনুমতি যদি দাও তবে ওর দুধ দোহন করি? মহিলা বললেন, হ্যাঁ, যদি দুধ দেখতে পান অবশ্যই দোহন করুন। এ কথার পর প্রিয় রসূল ﷺ বকরির ওলানে হাত লাগালেন। আল্লাহ পাকের নাম নিলেন এবং দোয়া করলেন। বকরি সাথে সাথে পা প্রসারিত করে দাঁড়ালো। তার ওলানে ভরা দুধ। প্রিয় রসূল ﷺ একটি বড় পাত্র নিয়ে সেই পাত্রে দুধ দোহন করলেন। সেই পাত্র ভর্তি দুধ একদল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারতো। দুধ দোহনের পর পাত্রে ফেনা ভরে গেল। সঙ্গীদের পান করালেন উম্মে মাবাদ নিজে পান করলেন। এরপর সেই পাত্রে পুনরায় দুধ দোহন করলেন। সেই পাত্র ভর্তি দুধ উম্মে মাবাদরে ঘরে রেখে আল্লাহর রসূল গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলেন।

কিছুক্ষণ পর মহিলার স্বামী বকরির পাল নিয়ে বাড়ী ফিরলো। সেসব বকরিও দুর্বল, পথ চলতে ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে। উম্মে মাবাদের স্বামী আবু মাবাদ দুধ দেখে তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন দুধ পেলে কোথায়? সব দুগ্ধবতী বকরি তো আমি চারণ ভূমিতে নিয়ে গেছি, ঘরে তো দুধ দেয়ার মতো বকরি ছিল না। উম্মে মাবাদ বললেন, আমাদের কাছে একজন বরকত সম্পন্ন মানুষ এসেছিলেন। তাঁর কথা ছিল এমন এবং তাঁর অবস্থা ছিল এমন। সব শুনে আবু মাবুদ বললেন, এই তো মনে হয় সেই ব্যক্তি যাকে কোরায়েশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা তুমি তার আকৃতি প্রকৃতি একটু বলো। উম্মে মাবাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে তিনি রসূলের পরিচয় বর্ণনা করলেন। আগন্তুকের ভূয়সী প্রশংসা শুনে সে বললো আল্লাহর শপথ এই হচ্ছে কোরায়েশদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে লোকেরা নানা কথা বর্ণনা করেছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর প্রিয় সঙ্গীদের একজন হবো। যদি কোন পথ পাই তবে অবশ্যই এটা করবো।

পথে সোরাকা ইবনে মালেক প্রিয় নবী ﷺএবং হযরত আবু বকরকে (রাঃ) অনুসরণ করেছিলেন সোরাকার বর্ণিত ঘটনা নিম্নরুপ। আমি আমার কওম বনি মুদলেজের এক মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর বসলো। সেই লোকটি বলল, ওহে সোরাকা একটু আগে আমি উপকূলের কাছে কয়েকজন লোক দেখলাম। আমার ধারণা তিনি মোহাম্মদ এবং তাঁর সাথী। সোরাকা বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে এরাই তারা, কিন্তু যে লোকটি খবর দিয়েছিল তার কাছে মনোভাব গোপন রাখার জন্য বললাম, না না ওরা তারা নয়, তুমি যাদের দেখেছ তাদেরতো আমরাও দেখেছি তারা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে গেছে। এরপর আমি মজলিসে কিছুক্ষণ বসে কাটালাম। তারপর ঘরের ভেতর গিয়ে আমার দাসীকে আমার ঘোড়া বের করার জন্য বললাম। গোড়া বের করার পর তাকে বললাম টিলার পেছনে নিয়ে যাও এবং সেখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। এরপর আমি তীর নিলাম এবং ঘরের পেছন দিয়ে বাইরে বের হলাম। তীরের এক প্রান্ত ধরে অপর প্রান্ত মাটিতে হেঁচড়ে আমি গোড়ার কাছে

গেলাম। গোড়ার পিঠে চড়ে বসলে ঘোড়া আমাকে নিয়ে ছুটতে লাগলো। এক সময় আমি উপকূলীয় এলাকায় তাঁদের নিকট এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ গোড়া লাফাতে শুরু করলো। আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। পুনরায় আমি গোড়ার পিঠে আরোহন করলাম এবং তূন এর দিকে হাত বাড়ালাম এবং পাশার তীর বের করে জানতে চাইলাম তাকে বিপদে ফেলতে পারব কিনা। কিন্তু যে তীর বের হলো সেটি আমার অপছন্দনীয়। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আল্লাহর রসূল নির্বিকারভাবে একাগ্রচিন্তে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন কোনদিকেই তাঁর খেয়াল নেই। আবু বকর সিদ্দিক পিছন ফিরে আমাকে দেখছিলেন। হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পা দুখানি মাটিতে দেবে গেল। হাঁটু পর্যন্ত দেবে গেল এক সময়। আমি গোড়া থেকে পড়ে গেলাম। ঘোড়াকে শাসন করলাম ঘোড়া উঠেতে চাইল। অনেক কষ্টে ঘোড়া নিজের পা উপরে তুললো। গোড়া পা তুললে তার পায়ের নিশানা থেকে ধোঁয়ার মতো ধুলো উড়ছিল। আমি তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করলাম, এবার এমন তীর বের হলো যা আমি চাইনি। এরপর আমি স্বাভাবিক কণ্ঠে তাদের ডাক দিলাম, তারা থামলেন। ঘোড়ার পিঠে করে আমি তাদের নিকটে পৌঁছলাম। যখনই আমি তাদের থামালাম তখনই হঠাৎ আমার মনে হলো আল্লাহর রসূলই বিজয়ী হবেন। আমি তখন আল্লাহর রসূলকে বললাম, আপনার স্বজাতীয়েরা আপনার জীবনের পরিবর্তে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে মক্কার লোকদের সংকল্প সম্পর্কেও আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তাঁকে পথের কিছু সম্বলও আমি দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না এবং আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করলেন না। শুধু বললেন, আমাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাকে নিরাপত্তার পরোয়ানা লিখে দিন। আল্লাহর রসূল তখনই আমের ইবনে ফোহায়রাকে আদেশ দিলেন। আমের নিরাপত্তার পরোয়ানা স্বরুপ এক টুকরা চামড়ায় কিছু কথা লিখে আমাকে দিলেন। এরপর আল্লাহর রসূল সামনে অগ্রসর হলেন।

সোরাকা মক্কায় ফিরে এসে দেখতে পেল, তখনো অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহর রসূলকেﷺ যে পথে দেখলাম সেদিকে কিছু লোককে দেখে সোরাকা বলল, ওদিকে তোমাদের যে কাজ ছিল সেটা হয়ে গেছে। দিনের শুরুতে যে লোক ছিল সন্ধানকারীদের একজন দিনের শেষে সেই ব্যক্তিই হয়ে গেল আমানতদার।

পথে বুরাইদা আসলামির সাথে রসূলের ﷺ সাক্ষাৎ হলো। এই লোক ছিল তার কওমের সর্দার। কোরায়েশদের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে এই লোকও রসূল এবং হযরত আবু বকরের সন্ধানে বের হয়েছিল কিন্তু রসূলের সাথে কথা বলার সাথে সাথে তার মনে ভাবান্তর হলো। তিনি নিজ গোত্রের ৭০ জন লোকসহ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মদীনা যাওয়ার পথে হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামের (রাঃ) সাথে প্রিয় রসূলের দেখা হলো। তিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তিনি প্রি নবী ﷺ এবং হযরত আবু বকরকে (রাঃ)সাদা কাপড় উপহার দেন।

কোবায় অবস্থানঃ

নবুয়তের চর্তুদশ বছরের ৮ই রবিউল আউয়াল অর্থাৎ ১লা হিজরী মোতাবেক ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার প্রিয় রসূল ﷺ কোবায় অবতরণ করেন।

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলেন, মদীনার মুসলমানরা মক্কা থেকে প্রিয় রসূলের রওয়ানা হওয়ার খবর জেনেছিলেন, এ কারণে মদীনার বাইরে হাররা নামক স্থানে এসে প্রতিদিন তারা অপেক্ষা করতেন। দুপুরের রোদ অসহ্য হয়ে উঠলে ফিরে যেতেন। একদিন এমনি করে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর সবাই ঘরে ফিরে গেছেন। এ সময় একজন ইহুদী ব্যক্তিগন কাজে একটি টিলার উপর উঠেছিল। হঠাৎ সে সাদা কাপড়েরর তৈরী চাঁদোয়া লক্ষ্য করলো। আনন্দের আতিশয্যে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, শোনো মুসলমানরা শোন, তোমরা যার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করছিলে তিনি আসছেন। একথা শোনা মাত্রই মুসলমানরা ছুটে এলো এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়লো।

ইবনে কাইয়েম বলেন, ঘোষণার সাথে সাথে বনি আমর ইবনে আওফের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল এবং তকবির ধ্বনি শোনা গেল। মুসলমানরা প্রিয় নবীর ﷺ আগমনের সম্বর্ধনার জন্য বেরিয়ে পড়লো। তারা প্রিয় নবীকে অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর চারপাশে ভিড় করতে লাগলো। সে সময় আল্লাহর রসূল ছিলেন নীরব। তাঁর ওপর তখন কোরআনের এই আয়াত নাযিল হচ্ছিল।

কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা কর তবে জেনে রাখো আল্লাহই তার বন্ধু, জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ন মোমেনরা উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী। (সূরা তাহরীম, আয়াত ৪)

আনসারদের মধ্যে যারা ইতি পূর্বে প্রিয় নবী ﷺ কে দেখেননি তারা হযরত আবু বকরকে সালাম করছিলেন। রসূলের গায়ের ওপর ঢলে পড়া সূর্যের কিরণ এসে পড়লে হযরত আবু বকর (রাঃ) একখানি চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া করে দাঁড়ালেন। এতে সবাই রসূলকে চিনতে পারলেন।

রসূলের অভ্যর্থনার জন্য মদীনায় জনতার ঢল নামলো। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। মদীনার মাটি এ ধরনের দৃশ্য অতীতে কোনোদিন দেখেনি। রসূল মদীনায় কুলসুম ইবনে হাদামের ঘরে অবস্থান করেন। হযরত আলী (রাঃ) মক্কায় তিনদিন অবস্থান করে মানুষের আমানতসমূহ বুঝিয়ে দিয়ে মদীনায় আসেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ কোবায় মোট চারদিন অবস্তান করেন। সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার। এ সময়ে তিনি মসজিদে কোবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং সেই মসজিদে নামায আদায় করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর এটি ছিল প্রথম মসজিদ। তাকওয়ার ওপর এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পঞ্চম দিন শুক্রবারে তিনি আমাদের আল্লাহর নির্দেশে সওয়ারীর ওপর আরোহন করেন। রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি তাঁরসামার গোত্রে বনু নাজ্জাহকে খবর পাঠালেন। ফলে তারা তলোয়ার সজ্জিত করে হাযির হলো। তিনি তাদের সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। বনু সালেম ইবনে আওফের জনপদে পৌছার পর জুমার নামাযের সময়

হলো। প্রিয় নবী ﷺ লোকালয়ে জুমার নামায আদায় করলেন। এখনো সেখানে মসজিদ রয়েছে। জুমার জামাতে একশ মুসল্লী হাযির হয়েছিলেন।

মদীনায় প্রবেশঃ

জুমার নামায আদায়ের পর প্রিয় নবী মদীনা গমন করেন। সেদিন থেকে ইয়াসরেবের নাম হয়েছে মদীনাতুর রসূল বা শহরে রসূল। সংক্ষেপে মদীনা। এই দিন ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন। চারদিকে আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। আনসার শিশুরা আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে এ গান গাইছিল।

দক্ষিণের সেই পাহাড় থেকে, উদয় হলো মোদের ওপর চতুর্দশীর চাঁদ।
শোকরিয়া আদায় করা আল্লাহ পাকের, কর্তব্য মোদের সকলের
তোমার আদেশ পালন আর আনুগত্য কর্তব্য মোদের সকলের, পাঠিয়েছেন
তোমায় আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।

আনসাররা ধনী বা বিত্তশালী ছিলেন না কিন্তু সবাই চাচ্ছিলেন যে, প্রিয় নবী ﷺ তার বাড়ীতে অবস্থান করবেন। যে এলাকা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন সেখানের লোকেরাই প্রিয় নবী ﷺ এর উটের রশি ধরে তাঁর বাড়ীতে আসার আবেদন জানাতেন। কিন্তু রসূল ﷺ বলে দিলেন যে, উটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর তরফ তেকে আদেশ পেয়েছে। এরপর উটনী ইচ্ছামতো চলতে লাগলো এবং বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী রয়েছে সেখানে গিয়ে থামলো। প্রিয় রসূল ﷺ উটনী থেকে নামলেন না। উটনী সামনে কিছুদূর এগিয়ে গেল এরপর পুনরায় ঘুরে আগের জায়গায় ফিরে এলো এবং বসে পড়লো। এটা ছিল প্রিয় নবীর নানাদের মহল্লা অর্থাৎ বনূ নাজ্জারদের মহল্লা। উটনীকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ায় সে বনু নাজ্জার এলাকায় থেমে নানাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। প্রিয় রসূলও মনে মনে এটাই চাচ্ছিলেন। এবার বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে তাকে যাওয়ার জন্য আবেদন নিবেদন শুরু করলো। আবু আইয়ুব আনসারী এগিয়ে এসে উটের লাগাম ধরলেন এবং তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এরপর রসূল ﷺ বললেন, আরোহী তার বাহনের সাথেই অবস্থান করবে।

কয়েকদিন পর প্রিয় রসূলের ﷺ সহধর্মিনী উম্মুল মোমেনীন হযরত সাওদা, দুই কন্যা ফাতেমা এবং উম্মে কুলসুম, উসামা ইবনে যায়েদ এবং উম্মে আয়মানও এসে পড়লেন। এদের সবাইকে হযরত আবু বকরের পরিবারের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর মদীনায় নিয়ে আসেন। হযরত আয়েশাও এদের সঙ্গে ছিলেন। প্রিয় নবীর ﷺ এক কন্যা হযরত যয়নব হযরত আবুল আস-এর কাছে রয়ে গেলেন। তিনি তখন আসতে দেননি। তিনি বদরের যুদ্ধের পর আগমন করেন।

এ পর্যন্ত প্রিয় নবীর জীবনের এক অংশ এবং ইসলামী দাওয়াতের মক্কী যুগ পূর্ণ হয়ে গেল।

মাদানী যুগ

মাদানী যুগকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ

এক) প্রথম, মুসলমানদের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একই সাথে বহিশত্রুরা মদীনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য মদীনার ওপর হামলা চালিয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত এ পর্যায় অব্যাহত ছিল।

দুই) দ্বিতীয়ত, পৌত্তলিকদের সাথে তাদের সন্ধি হয়েছিল। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এ পর্যায়ের সমাপ্তি হয়। এ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদের কাছে ইসলামরে দাওয়াত পেশ করা হয়।

তিন) তৃতীয়ত, আল্লাহ পাকের দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। এ পর্যায়ে মদীনায় বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং গোত্রের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। নবী করিম ﷺ এর জীবনের শেষ অর্থাৎ একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

রসূলুল্লাহ ﷺ কে এমন তিনটি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছিল যাদের ক্ষেত্রে ভিন্নতার প্রাধান্যই ছিল বেশী। এরা হচ্ছে,

এক) আল্লাহর মনোনীত রসূল ﷺ এর কাছ থেকে উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আল্লাহর পথে ধন প্রাণ উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত সাহাবা কেরাম (রাঃ) এর জামাত।

দুই) মদীনার প্রাচীন এবং প্রকৃত অধিবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী পৌত্তলিকরা তখনো ঈমান আনেনি।

তিন) ইহুদী সম্প্রদায় প্রথমতঃ সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে প্রিয় নবীকে ﷺ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা ছিল এই যে, মদীনার অবস্থা ছিল মক্কার অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ন পৃথক। মক্কায় যদিও তারা ছিলেন একই কালেমার অনুসারী তাদের উদ্দেশ্যও ছিল অভিন্ন, কিন্তু তারা বিভিন্ন পরিবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তারা ছিলেন শঙ্কিত দুর্বল ও অবমাননার সম্মুখীন। তাদের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। সকল ক্ষমতা শত্রুদের হাতে ন্যস্ত ছিল। যেসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে একটি সমাজ গঠন করা হয় মক্কায় মুসলমানদের হাতে তার কিছুই ছিল না। কিসের ভিত্তিতে মুসলমানরা সমাজ গঠনে সক্ষম হবে? এ কারণে দেখা যায় যে, মক্কায় অবতীর্ণ কোরআনের সূরাসমূহে শুধু ইসলামী দাওয়াতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ সময়ে এমন সব আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে যার ওপর প্রতিটি মানুষই পৃথক পৃথক আমল করতে পারে।

এ ধরনের কোন সমাজ একদিনে একমাসে বা এক বছরে গঠন করা সম্ভব নয় বরং এর জন্য প্রযোজন দীর্ঘ সময়। যাতে করে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রম নির্দেশ প্রদান করা যায় এবং আইণ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। নির্দেশ ও আইন কানুন বাস্তবায়ন মুসলমানদের প্রশিক্ষণ ও পথনির্দেশ প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সরাসরি রসূলে করিমের ﷺ ওপর।

আল্লাহ পাক পরিত্র কোরআনে বলেন, তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে রসূলরুপে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত তেলাওয়াত করে, তাদেরকে পবিত্র করেন

এবং তাদের কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, অথচ ইতি পূর্বে এরাই ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। (সূরা জুমুআ, আয়াত-২)

মুসলমানদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক ছিল। এক প্রকারের লোক যারা ছিলেন নিজেদের জমি, বাড়ী-ঘর এবং অর্থ-সম্পদের মধ্যে নিশ্চিন্তেই জীবন যাপন করছিলেন। এরা ছিল আনসার গোত্রের লোক। এদের পরস্পরের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে শত্রুতা চলে আসছিল। এদের পাশাপাশি আরেকটি দলে ছিলেন মোহাজের। তারা উল্লিখিত সুবিধা থেকে ছিলেন বনিঞ্চত। তারা কোন না কোন উপায়ে খালি হাতে মদীনা পৌছেছিলেন। তাদের থাকার কোন ঠিকানা ছিল না, ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোন কাজও ছিল না। সঙ্গে টাকা পয়সা বা অন্য কোন জিনিসও ছিল না। যা দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত ব্যবস্থা করা যায়। পরশ্রয়ী এসকল মোহাজেরের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছিল। কেননা কোরআনের ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল যে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের ওপর যারা ঈমান রাখে তারা যেন হিজরত করে মদীনায় চলে আসে। এটা তো জানাই ছিল যে, মদীনায় তেমন কোন সম্পদও নেই এবং আয়-উপার্জনের উল্লেখযোগ্য উপায়-উপকরণও নেই। ফলে মদীনার অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই সঙ্কট সময়ে ইসলামের শত্রুরা মদীনাকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে। এতে আমদানীর পরিমাণ কমে যায় এবং পরিস্থিতি আরো গুরুতর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ অন্য একটি দল ছিল মদীনার অমুসলিম অধিবাসী। তাদের অবস্থা মুসলমানদের চেয়ে ভালো ছিল না। কিছু অমুসলিম পৌত্তলিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের মধ্যে ছিল এবং নিজেদের পৈতৃক ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তনে দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মনে কোন প্রকার শত্রুতা বা বিদ্বেষ ছিল না। এ ধরনের লোকেরা অল্পকালের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলামন হয়ে গেল এবং সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হলো।

পক্ষান্তরে কিছু পৌত্তলিক এমন ছিল যারা মনে মনে নিজেদের বুকের ভেতর রসূলে করিম ﷺ এর মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করতো। কিন্তু মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার বা মোকাবেলা করার তাদের সাহস ছিল না। বরং পরিস্থিতির কারণে তারা রসূলে করিমের ﷺ প্রতি ভালোবাসার ভাব দেখাতো এবং সরলতার অভিনয় করতো। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। বুআসের যুদ্দের পর আওস ও খাযরাজ গোত্র তাকে নিজেদের নেতা করার ব্যাপারে একমত হয়েছিল।

এর আগে অন্য কোন ব্যাপারে এ দুটি গোত্র ঐক্যমত্যে উপনীত হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জন্য আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বর্ণঢ্য মুকুট তৈরী করছিল। এ মুকুট মাথায় পরিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বাদশাহ ঘোষণার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। এমনি সময়ে রসূলে করিম ﷺ মদীনায় এসে পৌছুলেন। জনগণের দৃষ্টি তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পরিবর্তে রসূলে করিমের ﷺ প্রতি নিবদ্ধ হলো। এ কারণে আবদুল্লাহ মনে করলো যে রসূলে করিমই ﷺ তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন। ফলে প্রিয় নবীর ﷺ প্রতি সে মনে মনে প্রচন্ড ঘৃণা পোষণ করতো। তা সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধের পর আবদুল্লাহ লক্ষ্য করলো যে, পরিস্থিতি তার অনুকুলে নয়, এ অবস্থায় শেরেক-এর উপর অঠল থাকলে সে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবে। এ কারণে সে

দৃশ্যত ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলো। কিন্তু মনে মনে সে ছিল কাফের। ফলে মুসলমানদের ক্ষতি করার কোন সুযোগই সে হাতছাড়া করেনি। তার সাথী ছিল ওই সকল লোক যারা এই মোনাফেকের নেতৃত্বে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু সেসব সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হলো। ফলে এরাও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতো। মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহর পরিকল্পনা এরা বাস্তবায়িত করতো।

তৃতীয়ঃ তৃতীয় শ্রেণীর লোক ছিল এখানকার ইহুদী। এরা অশোরী এবং রোমীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হেযাজে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল হিব্রু। হেযাজে আশ্রয় নেয়ার পর চালচলন কথাবার্তা পোশাক পরিচ্ছদে তাদেরও আরব বলে মনে হতো। এমনকি তাদের গোত্র এবং মানুষের নামকরণও ছিল আরবদের মতো। আরবদের সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এতোসব সত্ত্বেও তাদের বংশ-গৌরব তারা ভূলতে পারেনি। তারা নিজেদের ইসরাঈলী অর্থাৎ ইহুদী হওয়ার মধ্যেই গৌরব বোধ করতো। আরবদের তারা মনে করতো খুবই নিকৃষ্ট। ওদেরকে উম্মী বলে গালি দিত। এই উম্মী বলতো তারা বোঝাতো নির্বোধ, মুর্খ, জংলী, নীচু এবং অচ্ছ্যুৎ। তারা বিশ্বাস করতো যে, আরবদের ধন-সম্পদ তাদের জন্য বৈধ। যেভাবে ইচ্ছা তারা ভোগ ব্যবহার করতে পারবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, তারা বলে নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। (আলে ইমরান, আয়াত ৭৫)

অর্থাৎ উম্মীদের অর্থ-সম্পদ ভোগ ব্যবহার আমাদের জন্য দোষণীয় নয়। এসব ইহুদীদের মধ্যে তাদের দ্বীনের প্রচার প্রসারের ব্যাপারে কোন প্রকার তৎপরতা লক্ষ্য করা যেতো না। ভাগ্য গননা করা, যাদু, ঝাড়ফুঁক এ সবই ছিল তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ।

ইহুদীরা ধন-সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে ছিল দক্ষ। তারা খাদ্য-সামগ্রী, খেজুর, মদ এবং পোশাকের ব্যবসা করতো। ব্যবসা বাণিজ্যের মালামালের মধ্যে তারা আরবদের নিকট থেকে দ্বিগুণ তিনগুণ মুনাফা করতো। শুধু তাই নয় তারা সুদও খেতো। তারা আরবের শেখ সর্দারদের সুদের ওপর টাকা ধার দিতো। ধার নেয়া অর্থ আবর শেখ ও সর্দাররা খ্যাতি লাভের জন্য তাদের প্রশংসাকারী কবিদের জন্য উদারভাবে ব্যয় করতো। এদিকে ইহুদীরা সুদের ওপর অর্থ ধার দেয়ার বিনিময়ে বিভিন্ন জিনিস বন্ধক রাখতো। এতে কয়েক কছরেই ইহুদীরা সেসব সম্পত্তির মালিক হয়ে যেতো।

ইহুদীরা ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ছিল তুখোড়। সূক্ষ্মবাবে তারা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করতো। একটি গোত্রকে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে এবং লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তারা ছিল সদা-তৎপর। অথচ যারা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হতো তারা ঘৃণাক্ষরেও এসব বুঝতে পারত না। পরবর্তী সময়ে বিবদমান গোত্র গুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকতো। যুদ্ধের আগুন নিভু নিভু হয়ে আসছে লক্ষ্য করলে ইহুদীরা পুনরায় তৎপর হয়ে উঠতো।

মদীনার প্রধান তিনটি ইহুদী গোত্র

এক) বনু কাউনুকা। এরা ছিল খাযরাজ গেত্রের মিত্র। এরা মদীনার ভেতরেই বসবাস করতো।
দুই) বনু নাযির ও
তিন) বনু কোরাইযা। এ দুটি গোত্র ছিল আওস গোত্রের মিত্র। মদীনার শহরতলী এলাকায় এরা বসবাস করতো।

দীর্ঘকাল যাবত আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলছিল। বুআস-এর যুদ্ধে এরা নিজ নিজ মিত্র গোত্রের সমর্থনে নিজেরাও যুদ্ধে শরীক হতো। ইহুদীরা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছিল, এটাই ছিল স্বাভাবিক। এই ধরনের শত্রুতার স্বভাব তাদের চরিত্রে বহ ুকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। নবী করিম ﷺ তাদের বংশোদ্ভূত ছিলেন না, কাজেই তাদের আভিজাত্যের গৌরব কোন গুরুত্ব পাচ্ছিল না। নবী ﷺ যদি তাদের মধ্যে থেকে আবিভূত হতেন তাহলে তারা মনে শান্তি লাভ করতো। তাছাড়া ইসলামের দাওয়াত ছিল একটি বলিষ্ঠ দাওয়াত। এতে মানুষ শত্রুতা ভুলে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। ন্যায়নীতি আমানতদারী এবং হালাল হারামের বিচার-বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, এবার ইয়াসরেবের বিবদমান গোত্রসমূহের মধ্যে সোহার্দ্য সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে। এর ফলে ইহুদীদের বাণিজ্যিক তৎপরতা হ্রাস পাবে। তাদের অর্থনীতির প্রধান বৃত্ত সুদভিত্তিক সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

এ কারনে নবী করিম ﷺ আসার সময় থেকেই মদীনার ইহুদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি প্রবল শত্রুতা পোষণ করতো। তবে সেই শত্রুতার প্রকাশ তারা সহজে করেনি, একটু দেরী করে সেটা প্রকাশ করেছে। সহীহ বোখারীতে উল্লিখিত একটি বর্ণনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের (রাঃ) মুসলমান হওয়ার বিবরণ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন এক উচুস্তরের ইহুদী পন্ডিত। নবী করিমের ﷺ মদীনায় আগমনের খবর পাওয়ার পরই তিনি তাঁর নিকট হাযির হলেন এবং এমন কিছু প্রশ্ন করলেন যেসব প্রশ্নের উত্তর একজন নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। নবী করিমের ﷺ নিকট থেকে সেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি নবী ﷺ কে বললেন ইহুদীরা অন্যের নামে অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। যদি তাদের কারো কাছে আপনি আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তারা যা বলবে, আমার ইসলাম গ্রহণের খবর শোনার পরই বিপরীত রকমের কথা বলবে। রসূলে করিম ﷺ সাথে সাথে কয়েকজন ইহুদীকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যেকার সর্বশ্যেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বশ্যেষ্ঠ জ্ঞানীর পুত্র। অন্য এক বর্ণনায় এরুপ রয়েছে যে, তিনি আমাদের সর্দার এবং আমাদের সর্দারের সন্তান। রসূলে করিম ﷺ তখন বললেন, আচ্ছা বলতো, যদি শোনো আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মুসলমান হয়েছে? ইহুদীরা দুবার অথবা তিনবার বলল, আল্লাহ পাক তার হেফাযত করুন। এরপরই হযরত আবদুল্লাহ বেরিয়ে এলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদূ আন্না মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল। একথা শোনার সাথে সাথে ইহুদীরা বলল, এ হচ্ছে আমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তির সন্তান। এছাড়া তাঁর নামে আরো নানা খারাপ কথা বলতে লাগলো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায় আল্লাহ পাককে ভয় করো। সেই আল্লাহ পাকের সপথ যিনি, ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তোমরা ভালো করেই জানো যে, এই হচ্ছেন আল্লাহ পাকের রসূল। তিনি সত্যসহ আর্বিভূত হয়েছেন। কিন্তু ইহুদীরা বলল, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।
মদীনায় আগমনের প্রথমদিকেই ইহুদীদের সম্পর্কে রসূলেকরিমের ﷺ এরুপ অবিজ্ঞতা হয়েছিল।
এ যাবত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে সেসব কিছু মদীনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা। মদীনার বাইরে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল কোরায়েশরা। কোরায়েশরা বায়তুল্লাহ প্রতিবেশী ছিল এবং আরবদের মধ্যে ধর্মীয় নেতৃত্বের আসন ছিল তাদের দখলে। এ কারণে তারা সে প্রভাব বিস্তার করে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে মদীনাকে রাজনৈতিকভাবে বয়কট করলো। এর ফলে মদীনায় জিনিসপত্রের আমদানী কমে গেল। এদিকে মদীনায় মোহাজেরদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছিল।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

এরপর নবী করিম ﷺ মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য সেই জায়গা নির্ধারণ করেন যেখানে গিয়ে তাঁর উট যাত্রা বিরতি করে। সেই জমির মালিক ছিল দুটি এতিম বালক। রসূলে করিম ﷺ তাদের নিকট থেকে নায্য মূল্যে সেই যমিন ক্রয় করে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি নিজেও সমজিদের জন্য ইট ও পাথর বহন করছিলেন এবং আবৃত্তি করছিলেন। অর্থাৎ হে আল্লাহ জীবন তো প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের। আনসার ও মোহাজেরদের তুমি ক্ষমা করো। যদি আমরা বসে থাকি আর নবী করিম ﷺ কাজ করেন তাহলে আমরা পথভ্রষ্টতার কাজ করার জন্য দায়ী হবো।

সেই জমিতে পৌত্তলিকদের কয়েকটি কবর ছিল। কিছু অংশ ছিল বিরান উচু-নীচু। খেজুর এবং অন্যান্য কয়েকটি গাছও ছিল। নবী করিম ﷺ পৌত্তলিকদের কবর খোড়ালেন, উচু নীচু জায়গা সমতল করলেন। খেজুর এবং অন্যান্য গাছ কেটে কেবলার দিকে লাগিয়ে দিলেন। সে সময় কেবলা ছিল বায়তুল মাকদেস।

মসজিদের দরজার দুটি বাহু ছিল পাথরের। দেয়ালসমূহ কাঁচা ইট এবং কাদা দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। ছাদের ওপর খেজুর শাখা এবং পাতা বিছিয়ে দেয়া হলো। তিনটি দরজা লাগানো হলো। কেবলার সামনের দেয়াল থেকে পেচনের দেয়াল পর্যন্ত একশত হাত দৈর্ঘ ছিল। প্রস্থ ছিল এর চাইতে কম। বুনিয়াদ ছিল প্রায় তিন হাত গভীর।

নবী করিম ﷺ মসজিদের অদূরে কয়েকটি কাঁচা ঘর তৈরী করলেন। এসব ঘর ছিল প্রিয় নবীর ﷺ সহধর্মিনীদের বাসগৃহ। এসব ঘর তৈরী হওয়ার পর রসূলে করিম ﷺ হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রাঃ) ঘর থেকে এখানে এসে উঠলেন।

নির্মিত মসজিদ শুধু নামায আদায়ের জন্যই ছিল না বরং ইহা ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে মুসলমানগণ ইসলামের মূলনীতি ও হেদায়াত সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতেন।

এটি এমন এক মাহফিল ছিল যে, এখানে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘৃণা বিদ্বেষে জর্জরিত বিভিন্ন গোত্রের মানুষ পারস্পরিক সম্পীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে অবস্থান করতো। এই মসজিদ ছিল এমন একটি কেন্দ্র যে কেন্দ্র থেকে নবগঠিত যাবতীয় কাজ কর্ম পরিচালিত হতো এবং এখান তেকেই বিভিন্ন অভিযানে লোক প্রেরণ করা হতো। এছাড়া এই মসজিদের অবস্থা ছিল একটি সংসদের মতো। এতে মজলিসে শুরা এবং মজলিশে এস্তেজামিয়ার অধিবেশন বসতো।

এছাড়া এ সমজিদ ছিল সেইসব মোহাজেরিন এবং নিরাশ্রয় লোকদের আশ্রয়স্থল যাদের বাড়ীঘর, পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না।

হিজরতের প্রথম পর্যায় থেকেই আযানের প্রচলন শুরু হয়। এই আযান ছিল এক অপূর্ব মধুর সঙ্গীতের মতো। সেই সঙ্গীতের সুরে দিক দিগন্তে মুখরিত হয়ে উঠতো।

মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনঃ

নবী করিম ﷺ মসজিদে নববী নির্মাণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মিলন ও মিল মহব্বতের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। একইভাবে তিনি মানব ইতিহাসের এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং তা হচ্ছে মোহাযের ও আনসারদের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, অতপর নবী করিম ﷺ হযরত আনাস ইবনে মালেকের গৃহে মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। সে সময় মোট নব্বইজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। অর্ধেক ছিলেন মোহাজের আর অর্ধেক ছিলেন আনসার। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মূল কথা ছিল তারা একে অন্যের দুঃখে দুখী হবে সুখে সুখী হবে। মৃত্যুর পর নিকটাত্মীয়দের পরিবর্তে একে অন্যের সম্পত্তির উত্তারাধিকারী হবে। উত্তরাধিকারী হওয়ার এ নিয়ম বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এরপর আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের এইআয়াত নাযিল করেন, নিকটাত্মীয়রা একে অন্যের বেশী হকদার।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যেকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ভ্রাতৃত্রে সম্পর্ক অটুট থাকে।

এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে ইমাম গাযযালী (রহ) লিখেছেন, জাহেলী যুগের রীতিনীতির অবসান ঘটানো, ইসলামরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য মিটিয়ে দেয়াই ছিল এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য। এর ফলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, উচ্চ নীচের মানদন্ড তাকওয়া ব্যতীত অন্য কিছুতেই নেই।

রসূলে করিম ﷺ এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে শুধু অন্তসারশূন্য শব্দের আবরণে সজ্জিত করেননি। বরং এমন একটি অবশ্য করণীয় ও পালনীয় অঙ্গীকাররূপে আখ্যায়িত করেছিলেন যার সাথে জানমাল সম্পৃক্ত ছিল। এটা শুধুমাত্র মুখে মুখে উচ্চারিত এমন সালাম ও মোবারকবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না যার কোন ফলাফল নেই। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সাথে অত্মত্রাগ পরদুঃখকাতরতা,

সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির প্রেরণাও জাগরুক ছিল। প্রকারণে এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মদীনার নতুন সমাজকে দুর্লভ ও সমুজ্জল কর্ম তৎপরতায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।

সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, মোহাজেররা মদীনায় আগমনের পর রসূলে করিম ﷺ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) এবং হযরত সাদ ইবনে রবির (রাঃ) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এরপর হযরত সাদ ইবনে রবি (রাঃ) হযরত আবদুর রহমানকে বললেন, আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ধনী। আপনি আমার ধন-সম্পদের অর্ধেক গ্রহন করুন। আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। আপনি ওদের দেখুন। যাকে আপনার বেশী পছন্দ হয় তার কথা বলুণ। আমি তাকে তালাক দেব। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর আপনি তাকে বিবাহ করবেন। একথা শুনে হযরত আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ পাক আপনার পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আপনাদের এখানে বাজার কোথায়? তাকে বনু বাইনুকা বাজারের কথা জানানো হলো। তিনি বাজার থেকে ফিরে আসার পর তাঁর নিকট কিছু পনির এবং ঘি দেখা গেল। এরপর প্রতিদিন নিয়মিত তিনি বাজারে যাওয়া আসা করতেন। একদিন তিনি ফিরে আসার পর তাঁর গায়ে হলুদের চিহ্ন দেখা গেল। রসূলে করিম ﷺ এর কারণ জানতে চাইলেন। হযরত আবদুর রহমান বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি বিবাহ করেছি। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, মোহরানা কত দিয়েছ? হযরত আবদুর রহমান বললেন খেজুরের একটি আটি বরাবর স্বর্ণ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, আনসাররা নবী করিমের ﷺ নিকট আবেদন জানালেন যে, আপনি আমাদের এবং আমাদের ভাইদের মধ্যে আমাদের মালিকানাধীন খেজুরের বাগানগুলো বন্টন করে দিন। নবী করিম ﷺ রাজি হলেন না। আনসাররা তখন বললেন, তাহলে মোহাজেররা আমাদের বাগানে কাজ করুক, আমরা উৎপদিত ফলের মধ্য থেকে তাদেরকে অংশ দেব। নবী করিম ﷺ এতে সম্মতি দিলেন। অতপর আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করলাম।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আনসাররা কিভাবে মোহাজেরদের সম্মান করেছিলেন। মোহাজের ভাইয়ের প্রতি আনসারদের ভালোবাসা, সরল-সহজ আন্তরিকতা এবং আত্মত্যাগের পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়। মোহাজেররা আনসারদের এ ধরনের আচরণের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা আনসারদের নিকট থেকে কোন প্রকার বাড়তি সুবিধা গ্রহণ করেননি বরং ভঙ্গুর অর্থনৈতিক জীবন কিছুটা সজীব করে তোলার জন্য যতোটা সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন ততোটাই গ্রহণ করেছিলেন।

আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যেকার এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এক অনন্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণ্ণতার প্রমাণ। সেই সময় মুসলমানরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এই ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন ছিল তার চমৎকার সমাধান।

ইহুদীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন

হিজরতের পর রসূলে করিম ﷺ মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা-বিশ্বাস রাজনীতি এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে একটি নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করলেন। এরপর তিনি অমুসলিমদের সাথে

সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। নবী করিম ﷺ চাচ্ছিলেন যে, সকল মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করুক। মদীনা এবং এর আশে পাশের এলাকার মানুষ একটি সুস্থ প্রশাসনের আওতাভুক্ত হোক। তিনি উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে এমন আইন প্রণয়ন করলেন বর্তমান সংঘাত বিক্ষুব্ধ বিশ্বে যার কোন দৃষ্টন্ত খুজে পাওয়া যায় না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনার নিকটবর্তী লোকেরা ছিল ইহুদী। গোপনে এরা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করলেও প্রকাশ্যে মুসলমানদের সাথে শত্রুতার পরিচয় দেয়নি। এ কারেণে নবী করিম তাদের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হলেণ। সেই চুক্তিতে ইহুদীদেরকে তাদের ধর্ম পালন এবং জানমালের ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হলো। রাজনৈতিক হঠকারিতার কোন সুযোগ তাদের দেয়া হয়নি।

চুক্তির দফাসমূহঃ

১. ইহুদীরা নিজেদের সমুদয় ব্যয়ের জন্য দায়ী হবে এবং মুসলমানরা নিজেদের ব্যয়ের জন্য দায়ী হবে।

২. এই চুক্তির আওতাভুক্তদের কোন অংশের সাথে যারা যুদ্ধ করবে সবাই সম্মিলিতভাবে তাদের সাথে সহযাগিতা করবে।

৩. এই চুক্তির অংশিদাররা সকলেই পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবে। তবে সেই কল্যাণ কামনা ও সহযাগিতা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে - অন্যায়ের ওপর নয়।

৪. মযলুমকে সাহায্য করা হবে।

৫. যতদিন যাবত যুদ্ধ চলতে থাকবে ততদিন ইহুদীরাও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

৬. এই চুক্তির অংশীদারদের জন্য মদীনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকবে।

৭. এই চুক্তির অন্তর্ভূক্তদের মধ্যে কোন নতুন সমস্যা দেখা দিলে বা ঝগড়া-বিবাদ হলে আল্লাহ পাকের আইন অনুযায়ী রসূলে করিম ﷺ তার মীমাংসা করবেন।

৮. কোরায়েশ এবং তাদের সাহায্যকারীদের আশ্রয় প্রদান করা হবে না।

৯. ইয়াসরেবের ওপর কেউ হামলা করলে সেই হামলা মোকাবেলায় পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। সকল পক্ষ নিজ নিজ অংশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

১০. এই চুক্তির মাধ্যমে কোন অত্যাচারী বা অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া হবে না। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মদীনা এবং তর আশে পাশের এলাকা নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। সেই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদীনা। রসূলে করিম ﷺ ছিলেন সেই রাষ্ট্রের মহান নায়ক। এর মূল কর্তৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। এমনি করে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে নবী করিম ﷺ পরবর্তী সময়ে অন্যান্য গোত্রের সাথেও একই রকম চুক্তি সম্পাদন করবেন।

সশস্ত্র সংঘাত

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরায়েশদের ষড়যন্ত্র ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাথে পত্র বিনিময়ঃ

মুসলমানরা তাদের কবল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং মদীনায় তারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল এটা দেখে কাফেরদরে ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনো ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করেনি। মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল আনসারদের নেতা। মক্কার পৌত্তলিকরা আবদুল্লাহকে হুমকিপূর্ণ একটি চিঠি লিখলো। সেই সময় মদীনায় আবদুল্লাহর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের হুমকিপূর্ণ চিঠিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার পৌত্তলিক সহযোগীদের উদ্দেশ্যে লিখলো যে, আপনারা আমাদের লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, এ কারণে আমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, হয়তো আপনারা তার সাথে লড়াই করুন অথবা তাকে মদীনা থেকে বের করে দিন। যদি না করেন তবে আমরা সর্বশক্তিতে আপনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং যোদ্ধা পুরুষদের হত্যা করবো এবং আপনাদের মহিলাদের সম্মান বিনষ্ট করবো।

মক্কার পৌত্তলিকদের চিঠি পাওয়ার পর পরই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মদীনার সহওযাগীরা রসূলে মাকবুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। নবী করিম ﷺ এ খবর পেয়ে আবদুল্লাহর কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, কোরায়েশদের হুমকিতে তোমরা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছ মনে হচ্ছে। শোনো, তোমরা নিজেরা নিজেদের যতো ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছ মক্কার কোরায়েশরা তার চেয়ে বেশী তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা কি নিজেদের সন্তান এবং ভাইয়ের সাথে নিজেরাই যুদ্ধ করতে চাও? নবী করিম ﷺ এ কথা শোনার পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আবদুল্লাহর সাহযোগীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনকার মতো সমর্থক ও সহওযাগীদের ছত্রভঙ্গ হওয়ায় যুদ্ধ থেকে বিরত হলো। কিন্তু কোরায়েশদের সাথে তার গোপন যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। কেননা এই দুর্বৃত্ত মুসলমান ও কাফেরদের সাথে সংঘাতের কোন ক্ষেত্রেই নিজের জড়িত হওয়ার সুযোগকে হাতছাড়া করেনি। উপরন্তু মুসলমানরে বিরোধিতায় শক্তি অর্জনের জন্য ইহুদীদের সাথেও সে যোগাযোগ রক্ষা করতো, প্রয়োজনের সময় যেন ইহুদীরা তাকে সাহায্য করে।

মোহাজেরদের প্রতি কোরায়েশদের হুমকিঃ

কোরায়েশরা মুসলমানদের খবর পাঠালো যে, তোমরা মনে করো না যে, মক্কা থেকে চলে গিয়ে নিরাপদে থাকবে। ইয়াসরেবে অর্থাৎ মদিনায় পৌঁছে আমরা তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বো।

এটা শুধু হুমকি ছিল না। রসূলে করিম ﷺ নানা সূত্রে কোরায়েশদের ষড়যন্ত্র এবং অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হন। ফলে তিনি কখনো সারারাত জেগে কাটাতেন আবার কখনো সাহাবা কেরামের প্রহরাধীনে রাত্রি যাপন করতেন। অতপর পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযিল হলো যে, আল্লাহ পাক তোমাকে মানুষদের থেকে হেফাযত রাখবেন। এই আয়াত নাযিল হওয়ার

পর প্রিয় নবী জানালায় মাথা বের করে বললেন, হে লোকেরা তোমরা ফিরে যাও, আল্লাহ পাক আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। (তিরমিযী)
নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা শুধুমাত্র রসূলে করিম ﷺ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই ছিল এটা প্রযোজ্য। মদীনার আনসাররা অস্ত্র ছাড়া রাত্রি যাপন করতেন না এবং খুব সকালেও তাদের কাছে অস্ত্র থাকতো।

যুদ্ধের অনুমতিঃ

এ ধরনের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। তবে এ যুদ্ধকে ফরয বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। এই সময় আল্লাহ পাক কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন, যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা যাচ্ছে। কেননা তারা মযলুম। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।

যুদ্ধ করার এই অনুমতি নিছক যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল বা মিথ্যার মূল উৎপাটন এবং সত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি ওদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, সকল কাজের পরিনাম আল্লাহ পাকের এখতিয়ারে। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪১)

মুসলমানরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের সীমানা কোরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মক্কা থেকে সিরিয়ার মধ্যে মধ্যবর্তী পথ ছিল এই সীমানা। রসূলে করিম ﷺ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ সীমানা বিস্তৃত করার জন্য দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
এক) মক্কা থেকে সিরিয়া ও মদীনার যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার পথের পাশে যেসব গোত্রের বাস, তাদের সাথে যুদ্ধ না করার চুক্তি।
দুই) সেই পথে টহলদানকারী কাফেলা প্রেরণ।

ছারিয়্যা ও গোযওয়াহ

পবিত্র কোরআনের আয়াতে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের পর উল্লিখিত উভয় পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের পর্যায়ক্রমিক অভিযান শুরু হয়। অস্ত্র সজ্জিত কাফেলা টহল দিতে থাকে। এর উদ্দেশ্য ছিল মদীনার আশে পাশের রাস্তায় সাধারণভাবে এবং মক্কার আশে পাশের রাস্তায় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর ফলে মদীনার পৌত্তলিক ও ইহুদীদের এবং আশেপাশের বেদুইনদের মনে এ বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব হবে যে, বর্তমানে মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী। উপরন্তু এর মাধ্যমে কোরায়েশদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ সাহসিকতা সম্পর্কে তাদের ভীতবিহ্বল করে দেয়া সম্ভব হবে। তাদের ঝুকিয়ে দেয়া যাবে যে, তারা যে সব চিন্তা করছে এবং ক্রোধ প্রকাশ করছে তার পরিণাম ভয়াবহ। নির্বুদ্ধিতার যে পাঁক কাদায় তারা গড়াগড়ি খাচ্ছে তাতে তাদের অর্থনীতিকে হুমকির সম্মুখীন দেখে সন্ধি সমঝোতার প্রতি তারা ঝুঁকে পড়বে। মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের নিঃশেষ করা, আল্লাহ পাকের পথে বাধা সৃষ্টি

করা এবং দুর্বল মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করার যেসব সঙ্কল্প তারা মনে মনে পোষণ করছে সেসব থেকে বিরত থাকবে। এর ফলে জাাযরাতুল আরবে তওহীদের দাওয়াত প্রচারের কাজ মুসলমানরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করতে পারবে।
এসব গোযওয়াহ ও ছারিয়্যা সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হচ্ছে।

এক) ছ্যারিয়া রাবেগঃ

প্রথম হিজরীর শাওয়াল মোতাবেক ৬২৩ হিজরীর মার্চ মাস। রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উবাইদা ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মোত্তালেবকে এ ছারিয়্যার সেনানায়ক মনোনীত করেন। এ ছারিয়ায় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ জন মুহাজির। রাবেগ প্রান্তরে এই কাফেলা আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হয়। আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল দুশো। উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। কিন্তু এ ঘটনা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি।

এই ছারিয়্যায় মক্কার লোকদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হয়। এদের একজনের নাম হযরত মিকদাদ ইবনে আমর আলবাহরানী। অন্যজনের নাম ওতবা ইবনে গোজওয়ান আলমাজানি (রাঃ)। এই দুই জন গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা পৌত্তলিকদের সাথে যোগ দেন এই উদ্দেশ্যে যে পথিমধ্যে মুসলমানদের সাথে যদি সাক্ষাৎ হয় তবে তাদের কাছে চলে যাবেন। এ সময় উবাইদার পতাকা ছিল সাদা রংএর। তা বহল করছিলেন মেসতাহ বিন উছাছা বিন আবদুল মুত্তালেব বিন আবদে মানাফ।

দুই) ছারিয়্যা হাররার

প্রথম হিজরীর জিলকদ মোতাবেক ৬২৩ সালের মে মাস।

রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে এই ছারিয়্যার আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁর অধীনে বিশজন নিবেদিত প্রাণ মুসলমানকে কাফেরদের একটি কাফেলার সন্ধান করার জন্য প্রেরণ করেন। এই কাফেলাকে বলে দেয়া হয় তারা যেন হাররার নামক জায়গার পরে না যায়। এই কাফেলা পদব্রজে রওয়ানা হয়েছিল। এরা রাত্রিকালে সফর করতেন আর দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকতেন। পঞ্চম দিন সকালে এই কাফেলা খাররার পৌঁছে খবর পেলো যে, কোরায়েশদের বানিজ্য কাফেলা একদিন আগে খাররার ত্যাগ করেছে।

এই ছ্যারিয়্যার পতাকা ছিল সাদা এবং হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) পতাকা বহন করেছিলেন।

তিন) গোযওয়াহ আবওয়া

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মোতাবেক ৬২৩ সালের আগষ্ট।

এই অভিযানে সত্তরজন মোহাজের সমভিব্যহারে রসূলে করিম ﷺ গমন করেন। নবী ﷺ এই সময় মদীনায় হযরত সাদ ইবনে ওবাদাকে (রাঃ) তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। সেই

অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কোরায়েশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার পথ রোধ করা। নবী ﷺ ওদদান পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এই অভিযানের প্রাক্কালে রসূলে করিম ﷺ বনু জামরা গোত্রের সর্দার আমর ইবনে মাখশি জমিরির সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। রসূলে করিম ﷺ অংশগ্রহণ সম্বলিত এটি ছিল প্রথম সামরিক অভিযান। মদীনার বাইরে পনের দিন কাটানোর পর তারা মদীনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানে পতাকার রং ছিল সাদা। এই পতাকা বহন করছিলেন হযরত হামযা (রাঃ)

চার) গোযওয়ায়ে বুয়াত

দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস।
এই অভিযানে রসূলে করিম ﷺ দুইশত সাহাবাসহ রওয়ানা হন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কোরায়েশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা ধাওয়া করা। এই কাফেলায় উমাইয়া ইবনে খালফসহ কোরায়েশদের একশত লোক ছিল এবং এতে উটের সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার। নবী করিম ﷺ গোযওয়া এলাকায় অবস্থিত বুয়াত[১৪] নামক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এই অভিয়ানের প্রাক্কালে হযরত সাদ ইবনে মাযকে (রাঃ) মদীনার আমীর নিযুক্ত করা হয়। পতাকার রং ছিল সাদা। বহন করছিলেন হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)।

পাঁচ) গোযওয়া সফওয়ান

দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৩ সালের সেপ্টেম্বর।

এই অভিযানের কারণ ছিল এই যে, কারজ ইবনে জাবের ফাহাবির নামে একজন পৌত্তলিকের নেতৃত্বে একদল লোক মদীনার চারণভূমিতে হামলা করে এবং কয়েকটি গবাদি পশু অপহরণ করে নিয়ে যায়। রসূলে করিম ﷺ সত্তর জন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে লুটেরাদের ধাওয়া করেন। কিন্তু কারজ এবং তার সঙ্গীদের পাওয়া যায়নি। কোন প্রকার সংঘাত ছাড়াই তারা ফিরে আসেন। এই যুদ্ধকে কেউ কেউ বদরের প্রথম যুদ্ধ বরে অভিহিত করেন।

এই অভিযানের সময় মদীনার আমীর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পতাকার রং ছিল সাদা। হযরত আলী (রাঃ) বহন করছিলেন।

ছয়) গোযওয়া যিল উশাইরা

দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল আউয়াল এবং জমাদিউস সানি মোতাবেক ৬২৩ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর

এই অভিযানে রসূলে করিম ﷺ সাথে দেড় থেকে দুশ মোহাজের ছিলেন। এতে কাউকে অংশগ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয়নি। সওয়ারীর জন্য উটের সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ। পালাক্রমে সবাই সওয়ার হয়েছিলেন। মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে পৌত্তলিকদের এ ধরনের

একটি কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্যই এ অভিযান চালানো হয়। এই কাফেলায় কোরায়েশদের প্রচুর মালামাল ছিল। নবী করিম ﷺ এই কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্য যুল উশাইরা নামক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেন। কয়েকদিন অগেই কাফেলা চলে গেছে। এই কাফেলাই সিরিয়া থেকে ফেরার পর নবী করিম ﷺ তাদের গ্রেফতার করার চেষ্টা চালান কিন্তু তারা মক্কায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার জের হিসাবে পরবর্তীকালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই অভিযানে নবী ﷺ বনু মুদলাজ এবং তাদের মিত্র বনু জামরার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। নবী ﷺ এর এই অভিযান কালের মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুল আছাদ মাখযুমী (রাঃ) আনজাম দেন। এই অভিযানেও পতাকার রং ছিল সাদা। হযরত হামযা (রাঃ) পতাকা বহন করেন।

সাত) ছারিয়্যা নাখলাহ

দ্বিতীয় হিজরীর রজব মোতাবেক ৬২৪ সালের জানুয়ারী

এই অভিযানে রসূলে করিম ﷺ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের (রাঃ) নেতৃত্বে বারোজন মোহাজেরের একটি দল প্রেরণ করেন। প্রতি দুইজন সৈন্যের জন্য একটি উট ছিল। সেনাপতিকে নবী ﷺ একখানি চিঠি লিখে দেন এবং বলেন যে, দুইদিন সফর শেষেযেন চিঠিখানি পাঠ করা হয়। দুইদিন সফরশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) চিঠিখানি খুলে পাঠ করেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে আমার এই চিঠি পাঠ করার পর তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলাহ-এ অবতরণ করবে এবং সেখানে কোরায়েশদের একটি কাফেলার জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। পাশাপাশি খবরাখবর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে।

এই চিঠি পাঠ করার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সঙ্গী সাহাবীদের চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে জানান এবং বলেন যে, কারো ওপর জোর-জবরদস্তি করছি না, শাহাদাত যাদের প্রিয় তারা থেকে যেতে পারে। আমি যদি একা থেকে যাই তবু আমি সামনে অগ্রসব হবো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের (রাঃ) বক্তব্য শোনার পর তাঁরা নাখলাহ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যাওয়ার পথ হযরত সাদ ইবনে আমি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ওতবা ইবনে গোজওয়ান (রাঃ) এর উট উধাও হয়ে যায়। এই উটের পিঠে উভয় সাহাবী পালাক্রমে সফর করছিলেন। উট হারিয়ে যাওয়ার কারণে তারা উভয়ে পেছনে পড়ে যান।

সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) রাখলাহ গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যে, সেই পথ দিয়ে কোরায়েশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা অতিক্রম করেছে। সেই কাফেলায় কিসমিস চামড়া এবং অন্যান্য সামগ্রী রয়েছে। সেই কাফেলায় আবদুল্লাহ ইবনে মুগীরার দুই পুত্র ওসমান ও নওফেল এবং মুগীরার মুক্ত দাস আমর ইবনে হাযরামী ও হাকীম ইবনে কায়সান রয়েছে। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন যে কি করবেন। সেদিন ছিল রজব মাসের শেষ দিন। যুদ্ধ নিষিদ্ধ অর্থাৎ মাহে হারামের অন্যতম মাস হচ্ছে রজব। যুদ্ধ যদি করা হয় তবে হারাম মাসের অমর্যাদা করা হয়। এদিকে যদি হামলা না করা হয় তবে কোরায়েশদের এই কাফেলা মক্কার হারাম এলাকায় প্রবেশ করে। পরামর্শের পর হামলা করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাহাবীরা কোরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা অনুসরণ করেন এবং আমর ইবনে হাদরামিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন। এতে আমর ধরাশায়ী হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। অন্যরা ওসমান এবং হাকিমকে গ্রেফতার করেন। নওফেল পালিয়ে যায়। তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। অতপর সাহাবারা উভয় বন্দী এবং জিনিসপত্র নিয়ে মদীনায় হাযির হন। সাহাবারা প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে থেকে এক পঞ্চমাংশ গনিমত হিসাবে বের করে নিয়েছিলেন। এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গণিমতের মাল, প্রথম নিহত এবং প্রথম বন্দী। রসূলে করিম ﷺ সব কথা শোনার পর বললেন, আমিতো তোমাদেরকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি। তিনি আটককৃত মালামাল এবং বন্দীদের ব্যাপারে কোন রকমের বাড়াবাড়ি হতে দেননি।

এই ঘটনার পর অমুসলিমরা এ প্রোপাগন্ডার সুযোগ পায় যে, মুসলমানরা আল্লাহ পাকের হারাম করা মাসকে হালাল করে নিয়েছে। এটা নিয়ে নানারকমের অপপ্রচার চালানো হয়। অবশেষে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করে বলেন যে, পৌত্তলিকরা যা কিছু করছে সেসব তৎপরতা মুসলমানদের কাজের চেয়ে অনেক বেশী অপরাধমূলক এবং ন্যাক্কারজনক।

আল্লাহ পাক বলেন, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা বেশী অন্যায়। ফেতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়। (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭)

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের (রাঃ) নেতৃত্বে সংঘটিত ছারিয়্যার পর পৌত্তলিকদের মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। যে জালে আটকা পড়বে বলে তারা আশঙ্কা করে আসছিল সেই জালেই তারা আটকা পড়ে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মদীনার নেতৃত্ব অত্যন্ত জাগ্রত বিবেকসম্পন্ন। তারা মদীনায় বসে কোরায়েশদের বাণিজ্যিক তৎপরতার খবর রাখছে। মুসলমানরা ইচ্ছে করলে তিনশত মাইলের ব্যবধান ডিঙ্গিয়ে তাদের এলাকায় এসে যা খুশী তা করে যেতে পারে। হত্যা লুটতরাজ ইত্যাদি সবই তাদের দ্বারা সম্ভব। এসব কিছু করেও তারা নিরাপদে মদীনায় ফিরে যেতে সক্ষম। পৌত্তলিকরা বুঝতে পেরেছিল যে, সিরিয়ার বাণিজ্য নতুন বিপদের সম্মখীন। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা থেকে বিরত হয়নি। তারা ক্রোধ প্রকাশের পথ অবলম্বন করে। মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে নিঃশেষ করে দেবার হুমকি বাস্তবায়নে তারা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই ক্রোধই তাদেরকে বদর প্রান্তরে সমবেত করেছিল।

কোরআনের আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই সংঘর্ষে জয়লাভ মুসলমানদের হবে। বলা হয়েছে যে মুসলমানরা একটি বিজয়ী এবং সফলকাম জাতির অন্তর্ভূক্ত। এই ইঙ্গিত দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই জয় লাভ করবে। একথা ইশারায় বলার কারণ ছিল এই যে, আল্লাহ্ পাকের পথে জেহাদে যারা অতিমাত্রায় আগ্রহী তারা যেন বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের প্রমাণ দিতে পারে।

সেই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মোতাবেক ৬২৪ হিজরীর ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লাহ পাক মুসলমানদের এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন বায়তুল মাকদেসের পরিবর্তে কাবাঘরকে কেবলা হিসাবে মনোনীত করে এবং নামাযের মধ্যে যেন কাবার দিকে রোখ

পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের ছদ্মবেশে ঘাপটি মেরে থাকা মোনাফেকরা চিহ্নিত হয়ে যাবে। তারা মুসলমানদের নিকট তেকে পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। কেবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলমানদের এই ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে এক নতুন যুগের সুচনা হবে। মুসলমানদের নিজেদের কেবলা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। শত্রুর কবলে কেবলা থাকবে এটা হবে বিস্ময়ের ব্যাপার। এই কেবলা মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া হবে মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

পবিত্র কোরআনের এ সকল নির্দেশ এবং ইশারার পর মুসলমানদের মনে ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পায়। তারা জেহাদ ফি ছাবিলিল্লাহর প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পড়ে। তাদের মনে শত্রুদের সাথে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের আকাঙ্খা বহুগুণ বেড়ে যায়।

****